আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলা

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাত্র বছর চল্লিশ আগেও ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর চিত্রকলা ছিল প্রায় অজানা। ভারতের সৃষ্টির জগতের এই দিকটায় এমন অস্বাভাবিক অন্ধকারের বহুবিধ কারণ থাকতেই পারে কিন্তু একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে দেশজ জীবন্ত শিল্পের বহিঃপ্রকাশের অপ্রত্যাশিত অনুপস্থিতি। যাছিল তা হচ্ছে কিছু তৃতীয় শ্রেণীর ইউরোপীয় ছবির আরো তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ অথবা বিদেশের আমদানী সস্তা ওলিওগ্রাফ বা সমজাতীয় যান্ত্রিকতার দ্বারা প্রবল আঘাত প্রাপ্ত লোকশিল্প। ফলতঃ ভারতবর্ষের কলাক্ষেত্রে সর্বব্যাপ্ত খরা সংক্রান্ত রসালো বিদেশী তত্ত্বের গায়ে আরো মাংস লাগছিল এবং এও সত্য যে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে সমান্তরাল কোন তত্ত্ব গড়ে তোলাও সম্ভব হচ্ছিলনা। রেনেসাঁসের গোড়ার দিন গুলিতে দেশের শিক্ষিত জনসাধারনের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের প্রতি হাস্যকর ঔদাসীন্যর ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিকতা যেহেতু বিদেশী ভাষা এবং তত্ত্বের ঘোলাটে আলোয় আলোকিত, সোনামুঠি ফেলে ধুলোমুঠি আঁচলে গিট বাঁধতে তাদের কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই। আর এই স্বদেশবাসীরই বিভিন্ন কড়া মন্তব্য রেনেসাঁসের গোড়ার দিনগুলোতে তার প্রধান পুষরা হজম করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, স্রোত এখন বিপরীতমুখী। ভারতীয় শিল্প তার প্রাপ্য সম্মানের মহার্ঘ আসনে প্রতিষ্ঠিত। তবে যেহেতু আমরা এই পরিবর্তনের ধারায় মধ্যপথে তাই হয়তো এখনও এই নবতরঙ্গের প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণের যথাযোগ্য সময় আসেনি। তবু কয়েকটি হেতু এখনই আলোচ্য হতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ নিশ্চয়ই প্রধানতম কারণগুলির একটি। একথা সত্য যে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্মৃতিসৌধগুলি সম্বন্ধে বেশ কিছু পুস্তিকা এই শিল্পীদ্বয়ের আবির্ভাবের আগেই প্রকাশিত এবং সীমাবদ্ধ শিক্ষিত উপভোক্তার কাছে সেগুলি পৌঁছতে গেছে, তবু দূর্ভাগ্যবশতঃ শিশুসুলভ কিছু ধারণা ছাড়া এগুলির মধ্যে প্রকৃত শিল্পের উপকরণ ছিল অনুপস্থিত।

এরকম একটি সময়ে ভারতবর্ষে শিল্পে নবজাগরণের ধারার সূত্রপাত। ইতিমধ্যে কলকাতা, মাদ্রাজ, লাহোর এবং বম্বেতেস্থাপিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় কলাবিদ্যালয় কিন্তু সেখানে শিক্ষকরাও বিদেশী, শিল্পশিক্ষার ধারাও দেশজ নয়। এই বিদেশী শিক্ষকরাই যদিও ছাত্রদের মধ্যে দেশজ শিল্পের প্রতি ভালবাসা এবং উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। প্রথমদিকে বিভিন্ন ভারতীয় কাহিনী, রূপক এবং বিষয়ভিত্তিক চিত্র এবং ভাস্কর্য দেখা যেতে থাকে, তবে এগুলির পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভাবেবিদেশী ভাবধারায় প্রাণিত অক্ষম অনুকরণ মাত্র। এই শিল্পীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে কলকাতা, বোম্বাই এবং ত্রিবাঙ্কুরে দেশজ কলাশিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এই প্রয়াস, একই সঙ্গে স্বীকার্য, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুগতো ছিলই না, দেশের প্রধান নিজস্বতাগুলি বজায় রাখার চেষ্টাও সেখানে ছিল অনুপস্থিত - সেই দেশীয় নিজস্বতা যা মৃতনয়, সুপ্ত মাত্র।

দেশজ শিল্প তখন জীবিত হলেও তার ধারা অতি নিম্নগামী। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণা নেই, নেই কোন অনুপ্রেরণা। বহুপূর্বে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে জাত ব্যাপক নৈরাজ্য এবং অরাজকতার পরোক্ষ ফল এই ছন্নছাড়া ভাব। প্রধান শিল্পীরা রাজসভার নিরাপদ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছেন কাংড়া, গাড়ওয়াল এবং কাশ্মীরের গহন কন্দর এবং উপত্যকাবাসী। আর কোনক্রমে যাঁরা টিকেও গেছেন, তাঁদের পাশ্চাত্য শিল্পের ব্যর্থ অনুকারক হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারায় বিশ্বাস রেখে ইতিমধ্যে অনেক ঠকতে হয়েছে, হতে হয়েছে উপবাসে জীর্ণ, সহ্য করতে হয়েছে নতুন প্রভুদের অবজ্ঞা, স্বদেশবাসীর ভয়াবহ ঔদাসীন্য এবং পাশ্চাত্য ধারার অন্ধ অনুকারকদের অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্য। চোখমেলে নতুন করে তাকিয়ে পুনর্জাগরণের চেষ্টা যখন শুরু হল, দেশের শিল্প তখন ক্রম বিলুপ্তির শেষ ধাপে।

গত শতকের শেষধাপে কোন এক সময় একজন শিল্পী পাশ্চাত্য প্রভাবের বহুধাব্যাপী আচ্ছাদনের নিছিদ্র ঘেরাটোপ থেকেবেরিয়ে আসার মনোভাব নিয়ে পূর্বপুরুষের গূঢ়চারী কিন্তু অধুনা বিলুপ্ত পথে পুনঃপদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলেন। জন্ম তাঁর বাংলার সেই প্রধান পরিবারের যে পরিবার ইতিমধ্যেই জন্ম দিয়েছে আধুনিক রাজপুত্র, স্বস্থ ভূস্বামী, সংগীতবিদ, সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক এবং এমনই এক কবির যাঁর প্রতিভা এবং খ্যাতির বিভায় বিশ্বের গহনতম কোণটিও উদ্ভাসিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাথমিকভাবে যদিও তাঁর প্রশিক্ষণ সেই বহুকথিত বিদেশী ধারাতেই এবং সেই পথে তাঁর ব্যক্তি গত দক্ষতার বহু প্রমাণও বর্তমান, তবু বহু ব্যবহারে জীর্ণ, ভাঙ্গনধরা সেই পথটি ছেড়ে অচিরে সম্পূর্ণ অজানা পথে পা বাড়াতে তাঁর সামান্যতম দ্বিধাও দেখা যায়নি। সেই পদক্ষেপের চুড়ান্ত ফলাফল সংক্রান্ত বিতর্ক এখনও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি।

পাশ্চাত্য শিল্পধারায় অনুসরণের কালে অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনতিবিলম্বে এই সত্য প্রকাশিত হল যে শিল্পের যে বিশেষ ধারায় তিনি তখনও এগিয়ে চলেছেন, তাতে সামান্যতম অনুপ্রেরণারও অভাব তো বটেই, তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতেও তা অক্ষম। এবং তাঁর মনশ্চক্ষে পরিদৃশ্যমান দৃশ্যাবলী পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রকাশেও তিনি অপারগ। বাস্তবতা এবং রূপের অভেদত্ব সংক্রান্ত পাশ্চাত্য দাবী তাঁর তুলির উপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করছে, তাতে তাঁর কল্পনার বহিঃপ্রকাশ শিকার হচ্ছে অহেতুক দৌর্বল্যের। ফলতঃ বহু সজাগ ও বিনিদ্র চিন্তারজনী অতিক্রমের পর আধুনিক পাশ্চাত্যকলা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে তিনি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ধারার অনুশীলনে তাকে করে তুললেন শাণিত এবং উন্নত। ব্যাক্তিগত পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ই.বি.হ্যাভেলের। এর আগে মাদ্রাজের সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ থাকার সময় হ্যাভেল ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নেশজ ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

অজানা পথে আলোকবর্তিকা হাতে প্রথম পথিকের পথ সর্বদাই কণ্টকাকীর্ণ। প্রথম পর্যায়ে অবনীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী সর্বদা তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে অবক্ষয়ী এবং স্থূল অভিযোগে শোরগোল তুলেছেন। আজও অবস্থা যেখুব একটা পাল্টেছে এমন নয়। তবে সেই সব বোদ্ধারা যাঁরা মাত্র ত্রিশ বছর আগে নিন্দার ঢেউ তুলেছিলেন, আজ তাঁদের অনেকেই ধাঁধায় পড়ে মৌনব্রত অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন কারণ পাশ্চাত্য সমালোচকরা আজ শিল্পের এই নব্যধারা সম্বন্ধে অনুকুল মতামত দিচ্ছেন।

ভারতীয় শিল্পকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন যে মুষ্টিমেয় কলারসিক এবং শিল্প সমালোচক, তাঁদের প্রধান হিসাবে ই.বি. হ্যাভেলের নাম অবশ্যই চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ মুঘল রীতিতে কলা চর্চা যদিও আরম্ভ করেছিলেন পূর্বেই, তবু সমালোচনার ঝড়ে দিক্‌ভ্রান্ত এবং দিশাহারা নব্যধারায় গুরু শিষ্য আশ্রয় এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই হ্যাভেলেরই সক্ষম লেখনী এবং সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া সরকারী কলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতাকালে পদাধিকারবলে এই হ্যাভেলের নির্বন্ধাতিশয্যই শিক্ষক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের নিয়োগ তাঁর প্রদর্শিত নব্যধারার যথাযোগ্য পরিচিতি প্রাপ্তিতে সাহায্য করেছিল। এই ধারা এবং প্রাচীন কৃৎকৌশলের পুনর্নবীকরণ যখন জিজ্ঞাসু তখন মনে প্রশ্ন জাগাল, প্রভাব ফেলল, তখনই সূত্রপাত হল নতুন যুগের।

পাশ্চাত্য পাঠক মানসে ইতিমধ্যেই হ্যাভেল, ওকাকুরা, ভগিনী নিবেদিতা এবং অন্যান্যদের লেখনপ্রসূত রচনাবলী প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহের জন্ম দিয়েছে। এই নতুন প্রয়াস এখন স্যার জন উড্রফ, লর্ড কিচ্‌নার ইত্যাদি বিদেশী কলারসিকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হল।

দেশে যাঁরা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যধারায় শিল্পকে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে স্বাগত জানালেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর কিছু আত্মীয়, সুহৃদ এবং দুটি প্রধান মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য, এই কারণে তাঁদের বহু সমালোচনা এবং বিদ্রুপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। জনমত যে আদৌ অনুকুল নয়, সেকথা প্রথমেই পরিষ্কারহয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় নানা রসালো লেখা ছাপা

হতে লাগল। সঙ্গে সস্তা ভাঁড়ামিতে ভরা বিদ্রূপচিত্র। বস্তুতঃউপরোক্ত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকাদ্বয়ই ছিল সেকালে একমাত্র ব্যতিক্রম। কালে কিন্তু দেখাগেল, আশ্চর্যজনক হলেও এই হিংস্র মনোভাবের একটি অনুকূল প্রতিক্রিয়া আছে। এই সব তথাকথিত রসগর্ভ রচনা ভারতীয় শিল্পে উৎসাহী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলল যে মানসিকতা তা তখন পর্যন্ত ছিল অজানা। মধ্যযুগীয় এবং পরবর্তীকালে মুঘল যুগের বিভিন্ন শিল্পধারার চিত্রকলা, অজন্তার ফ্রেস্কো, প্রাচীন মন্দির বা স্তম্ভগাত্রে খোদিত স্থাপত্য- এ সবই দেখা হতে লাগল অদৃষ্টপূর্ব কৌতুহলের সঙ্গে। ফলতঃ জাতীয় স্তরে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব শিল্প সচেতনতা।

নব্যধারায় শিল্প যে এই সচেতনতাজাত বোধে বিপুলবোধে সম্বর্ধিত হল এমনটা কিন্তু নয়। আমাদের প্রাচীন বাংলার এই প্রবাদটি তৎকালীন দেশীয় শিল্পবোদ্ধাদের মনোভাবকে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে- পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই তবে তার গুণ গাই।

এই শিল্পী এবং তাঁদের সমর্থনের কাজ সুতরাং আগের মতই হয়ে রইল। কঠিন, বহু নিন্দিত এবং হাস্যকর ভাবে সমালোচিত।

কিন্তু অজান্তে কখন যেন স্রোত বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। অতীতের ঐশ্বর্যময় আসরে অবগাহন করে অনেকেই পেলেন শ্রমের পুরস্কার। এঁরা স্বাভাবিকভাবেই নব্যধারায় শিল্পের দিকে ঝুঁকলেন কৌতুহলী মনে - হয়তো এখানেই আছে সেই সন্তুষ্টির বীজ। নব্যধারার শিল্পীদের মধ্যে মডেলিং অনুশীলনের চূরান্ত অভাবজাত রূপের একঘেয়েমি অনেককেই করে তুলত বিতৃষ্ণ। শারীর সংস্থান এর পরিপ্রেক্ষিতে অশ্রদ্ধা কোন কোন দর্শকদের সৌন্দর্যবোধকে বিপর্যস্ত করল। বিভিন্ন প্রকৌশলের অপ্রত্যাশিত মিশ্রণে প্রাচীন পন্থী দর্শক অস্বস্তি পেলেন। কিন্তু এমনও কেউ ছিলেন যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দক্ষতায় অনুভব করলেন বিমূর্তর সূক্ষ্ম এবং নির্ভার স্পর্শ, আস্বাদন পেলেন শিল্পীর সংবেদনশীল চিন্তাধারার আবেশী অনুরণনের। সেই অনুভূতি যা পরিপ্রেক্ষিত, ছায়া বা মডেলের স্মৃতি মুক্ত। এই কতিপয় বিরল সূক্ষ্মমনস্ক দর্শকের সহায়তাতেই ধীরে কিন্তু নির্ভুলভাবে নতুন ধারা এগিয়ে চলল।

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারায় সমর্থকদের একটা মস্ত অংশই ছিলেন বিদেশী নন্দনবিদরা। মূলত তাঁরা ইউরোপীয় এবং জাপানী এবং প্রধানত এঁদের সহায়তায় এই নব্যধারা একটা মোটামুটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পেরেছিল। এই সময়েই(১৯০৭) ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের সূচনা অনেকখানি ইউরোপীয় সহায়তায় এই ভালোবাসার ধন হঠাৎ পাওয়া রেনেসাঁসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। ফলে আরো প্রসারিত হল অবনীন্দ্রগোষ্ঠীর সৃষ্টিকুশলতা। কলার বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হল এর ত্রিয়াক্ষেত্র এবং ক্রমান্বয় সরকারী এবং ব্যক্তি সহযোগিতায় এই আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই চরিত্রগত ভাবে হয়ে উঠতে পেরেছিল জাতীয়তাবাদী।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য অত্যাধুনিক ধারা নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত করেন এবং অচিরাৎ পাশ্চাত্য ভাব এবং প্রাচ্য আদর্শর মিশ্রণে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক অভূতপূর্ব পথে পা রাখলেন। এছাড়া ওকাকুরা, তাইক্কান, হিসিদা, আরাই প্রভৃতি প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী এই নব্যধারার ভারতীয় শিল্পীদের কাজে মোহিত হয়ে এদেশে অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় চিত্রকলা শিখতে আসেন এবং একইসঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের জাপানী কৌশলে চিত্রকলার ধারাবাহিক প্রশিক্ষণও দিতে থাকেন। ফলতঃ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় তূণীরে সমাহার হয় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ ব্যাপক পদ্ধতি, মাধ্যম এবং প্রকৌশলের। এর থেকেই তাঁরা নির্ণয় করেন এমন ধারা যা তাঁদের প্রকরণকে কোনভাবে দ্বিধান্বিত না করে।

এমন নয় যে এই পর্যায়ে যা হয়েছিল, তা সবই নিখুঁত। এই পরিবর্তনের কাল অতিক্রান্ত একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। বিবিধ প্রকৌশলকে আপন করার চেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে এবং এমনও দেখা গেছে যে পাশ্চাত্য প্রভাব এবং পদ্ধতি এড়িয়ে চলার তীব্র উৎসাহ শিল্পকেই পাঠিয়ে দিয়েছে পিছনের

আসনে। শিল্পের ক্ষেত্রে একরোখা জেদী মনোভাব বাঁধা গতে চলার মতই ক্ষতিকর এবং এই কারণে বহু শিল্পকর্ম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সোৎসাহ কিন্তু বিচারবোধহীন স্বঘোষিত শিল্পরসিকরা বিপদের একটি স্থায়ী উৎস ছিলেন এবং আছেন। অতীতের কাজগুলি খুঁত এবং উন্মত্ততাকেই অনেকে আদর্শ এবং অতীব প্রয়োজনীয় ধরে নিয়েছিলেন।কেউ কেউ এমনকি এও ভেবেছিলেন যে আধুনিক কৃৎকৌশলের প্রশিক্ষণদক্ষতা কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, বিপজ্জনকও বটে। এই অস্বাভাবিক মতামতজাত শিল্প অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ, শিল্পের আত্মা সেখানে অনুপস্থিত।

কিন্তু এই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা আন্তরিক - যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ - তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁদের অনুগামীদের থেকে অনেক প্রশস্ত। এঁদের শিল্পবোধ এত গভীরসঞ্চারী ছিল যে তাৎক্ষণিক কিছু বিচ্যুতি ছাড়া পরস্পরবিরোধী এই মতামতের ঢেউ খুব একটা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁদের মানসকে। পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য ধারাই তাঁদের কাছে যদিও ছিল অনেক গ্রহণযোগ্য কিন্তু ব্যক্তি গত এই পছন্দ অপছন্দবোধ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্যকে হ্রাস করেনি বিন্দুমাত্র। আত্ম উন্মোচনের জন্য বিভিন্ন কৃৎকৌশল ঘেঁটে দেখার কাজে তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না।

যথাসময়ে এই আন্দোলনে যৌবনের ও অভিষেক হয়েছে। আন্দোলন পেয়েছে নতুন গতি এবং আধুনীকতার ভাব। দেশ ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ধারায় ভারতীয় শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। ভারতবর্ষে সর্বত্র খোলা হয়েছে নতুন কলাবিদ্যালয়, শিল্পসংস্থা। নানা স্থানে বিভিন্ন প্রদর্শনীও হয়েছে। ভ্রাম্যমান প্রদশ্রনী যাচ্ছে জাভা, জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে। প্রচার বাড়ছে। পাওয়া যাচ্ছে পৃষ্ঠপোষণা। পাওয়া যাচ্ছে এমনকি স্বয়ং রাণী মেরী এবং বর্তমানে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্কুইচ অফ্ জেটল্যান্ড- এর কাছ থেকেও। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে নব চিত্র পদ্ধতি আহ্বনে আগ্রহী বিভিন্ন কলাবিদ্যালয়গুলি নব্যধারায় শিল্পীদের পাবার জন্য উন্মুখ। সংক্ষেপে বলা যায় রেনেসাঁস এখন পূর্ণযৌবনে।

আদর্শ এবং প্রকৌশলগতভাবে তখনকার মত এখনও এই নব্যধারাকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে এই ধারায় বিভিন্ন সমর্থকদের মাধ্যম এবং নিজস্ব আঙ্কনশৈলির ক্রমান্বয় পরিবর্তনশীলতা এর একটি কারণ। ন্যূনতমবস্তুগত বহিঃপ্রভাব ছাড়াই শিল্পীর ব্যক্তি গত ভাবনার উপস্থাপনার আদর্শ এদের কাজে সদা উপস্থিত। তাঁর বর্হদৃষ্টির সম্মুখে পরিদৃশ্যমান বস্তুরাজিকে অতিত্র ম করে যেন শিল্পী অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর বিষয়কে দর্শন করছেন। ব্যক্তিগত এই নবলব্ধ দৃষ্টিকে তিনি রেখা, বর্ণ বা ওয়াশের মাধ্যমে অনুবাদ করছেন যেন। বিমূর্ততায় দৃষ্ট এবং অনুভূত বোধের উন্মোচনই একমাত্র প্রকৌশল এবং সেজন্য ব্যবহৃত মাধ্যমের উপর শিল্পীর দখল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার কোন চেষ্টা বা বাসনা তাঁর তরফে অন্তত নেই। তবে নিঃসন্দেহে এই মূল ধারণা ছাড়া আর কিছু বহিরাঙ্গিকতা তাঁদের কাছে মূর্ত হয়েছিল। শিল্পীর মানসিকতা, মানসিক ঘাত - প্রতিঘাত এবং ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তা পরিবর্তমান। হোগার্থ যাকে 'সৌন্দর্যরেখা' বলেছেন, সেই বোধে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই রেখাকে ধরা হয়েছে কেবলমাত্র সহায়ক উপাদান হিসেবেই। প্রধানতঃ তুলির কাজের সঙ্গে বর্ণের নিবিড় নির্যাসে প্রস্তুত হয় এমন প্রতিক্রিয়া যা দূরাগত সংগীতপ্রায় - সেই সংগীতের স্বরলিপি এখনও অজানা। বর্ণোজ্জ্বলতার সঙ্গে ব্যবহৃত কম্পোজিশনের উদ্দাম কল্পনা, এমনটাই তো অতীতের প্রাচ্য শিল্পকলায় ছিল বহুল ব্যবহৃত।

চিন্তা এবং বিষয়ের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, অসিতকুমার হালদার, শামী-উজ্-জমান প্রমুখ তরুণ শিল্পীরা প্রমাণ করলেন যে এই নব্যধারা কেবলমাত্র একক এক অনন্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নয়, তা চিন্তা এবং নিজস্বতার ক্ষেত্রে উন্নয়নে সক্ষম। এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদিও এই নব্যধারার ক্রিয়াকলাপের বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব, তবু সৌভাগ্যবশতঃ ইচ্ছুক উৎসাহী কলারসিকদের কাছে বিবিধ প্রকাশনা এবং মূল ছবিগুলি চোখে দেখার সুযোগ বর্তমান। তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শিষ্যরা ব্যক্তি গতভাবে বা সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের মাধ্যমে গোষ্ঠীগতভাবে অজস্র চিত্রের জন্ম দিয়েছেন। ব্যাপক ছিল

তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্র। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় তাঁদের স্বাধীন, সদর্প বিচরণ। চিত্রই হোক বা ভাস্কর্য বা এমনকি ঘর সাজাবার টুকিটাকি - বহুধাবিস্তৃত তাঁদের প্রতিভার সাক্ষর।

তৎসহ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিগূঢ় অন্বেষণে পুনরাবিষ্কৃত হল বহু অজানা ঐশ্বর্য। কেবলমাত্র এই কারণেই সোসাইটির ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

আর অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইমাত্র বলাই যথেষ্ট যে তিনি সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় একটি সম্পূর্ণ জাতিকে শিল্প সচেতন করে তুলেছেন। অতীতের বিলুপ্ত সংস্কৃতি সম্বন্ধে লুপ্ত শত্ত বিশ্বাসবোধকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনিই। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় শিল্পসংস্কৃতির একদা জীবন্ত কিন্তু অধুনালুপ্ত ধারাকে সর্বসমক্ষে ফিরিয়ে এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ। যে পথে তিনি প্রথম হেঁটেছিলেন, তা আজ সহস্র শিল্পীর দৃপ্ত পদক্ষেপে উজ্জ্বল - এই তো এক গরিষ্ঠ শিল্পীর মহত্তম সাফল্য। আর এই নব নব পদচারণাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁরাই ব্যক্তিগত ধারায় প্রতিষ্ঠিত, প্রেরণাপ্রাপ্ত এবং পোষিত। তাঁরচিত্রে রূপায়িত যে অধরা মাধুরী, এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তার মূল্যায়ন অসম্ভব।

পৃথিবীর এমন দুঃসময়। শিল্প এবং শিল্পীকে নিয়ত যে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাতে তাঁদের অস্তিত্বই বিপন্ন। একদা দেশজ শিল্পের স্বাধীনতায় যাঁরা নিজেদের যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কৃতজ্ঞতার ঋণ বিস্মৃত হওয়া সহজ।তবু ভারতীয় শিল্পে রেনেসাঁস সম্মুখগামী। কঠিন ঝড় অতিক্রম করে সুসময় এলে বোঝা যাবে ভারতীয় শিল্পের গন্তব্য। অবনীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই সেই লক্ষ্য নিহিত।

অনুবাদ ঃ দেবাশিস গুপ্ত